সূচিপত্র

ভূমিকা.....৭
মৃত্যুকে স্মরণ করুন ১১
আকাঙ্ক্ষা বজায় রাখুন ১৪
উপযোগী মিথ্যার ব্যবহার করুন ১৬
ইতিবাচক ফলাফলের দিকে নজর রাখুন ১৭
ঘাম ঝরাতে শিখুন ১৮
নিজের জীবনকে সহজ করুন..... ২০
নিজের খেয়াল রাখুন ২৩
ভুল পথে পরিচালিত হবেন না..... ২৪
নিজের কাজ সম্পূর্ণ করুন ২৫
কাজে সৃজনশীলতা বজায় রাখুন..... ২৭
সফলতার মূলমন্ত্র খুঁজে নিন..... ২৮
সময় কাজে লাগান ৩০
কাজের পরিকল্পনা করুন..... ৩১
কাজ করার মানসিকতা তৈরি করুন..... ৩৩
ধারাবাহিকভাবে কাজ করুন ৩৫
সত্যিকার বন্ধু নিয়ে বাঁচুন ৩৫
নিজের প্রকৃত সত্তাকে প্রকাশ করুন ৩৬
নিরিবিলি চিন্তাভাবনা করুন ৩৮
হতাশা দূরীকরণের উত্তম ঔষধ ৪০
লোকে কী ভাববে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না ৪২
স্বকীয় স্বভাব বজায় রাখুন..... ৪৪
টেলিভিশন আসক্তি কমিয়ে নিন..... ৪৬
চ্যালেঞ্জ নিতে শিখুন..... ৪৭
দৈনন্দিন পরিকল্পনা বানান..... ৪৮
নিজের মেধা আবিষ্কার করুন ৪৯
কখনো ভয় পাবেন না ৫১
সম্পর্কের যত্ন নিন ৫৩
সৎ মানুষদের সাথে সময় কাটান..... ৫৫
নিজের ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করুন..... ৫৬

নিজস্ব সংস্কার তৈরি করুন, পালন করুন ৫৭
সর্বাবস্থায় সুখ অনুভব করুন ৫৮
নিজেই নিজের সব হয়ে উঠুন ৬০
আত্মশৃঙ্খলা বজায় রাখুন ৬১
নেতিবাচক সংবাদ থেকে বিরতি নিন ৬২
বর্তমানে বসবাস করুন ৬৩
কৌতূহলী হয়ে উঠুন ৬৫
পরোপকারে নিয়োজিত হোন ৬৭
উত্থান-পতন মেনে নিন ৬৯
আত্মমর্যাদাবান হয়ে উঠুন ৭১
জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে নিন ৭২
মস্তিষ্কের বাম অংশের প্রভাবমুক্ত হোন ৭৫
মস্তিষ্কের ইতিবাচক নির্দেশনা শুনুন ৭৬
অনুসরণীয় একজন হিরো বেছে নিন ৭৬
আপনিও এক সৃজনশীল সত্তা ৭৭
কাজের মাঝেই আনন্দ খুঁজে নিন ৭৮
নিয়মিত রিল্যাক্স করুন ৭৯
প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করুন ৮১
সমস্যাকে ভয় পাবেন না ৮২
আইডিয়া সংরক্ষণ করুন ৮৪
নিজের লক্ষ্যকে ভাগ করে নিন ৮৬
প্রতিদিনই লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ৮৮
থিংক আউটসাইড দ্য বক্স ৯১
আশাবাদী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠুন ৯২
নেতিবাচক চিন্তাকে বিদায় জানান ৯৫
জীবন নিয়ে সিরিয়াস হোন ৯৭
মস্তিষ্ককে কাজে লাগান ১০০
কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আনুন ১০২
নতুন ক্ষেত্রকে আলিঙ্গন করুন ১০৩
আপনার পুরানো অভ্যাস উন্নত করুন ১০৫
পেইন্ট ইয়োর মাস্টারপিস টুডে ১০৬
পানির নিচে সাঁতার কাটুন ১০৭
একজন ভালো কোচ রাখুন ১০৯
নিজের বাসা বিক্রির চেষ্টা করুন ১১২

নিজের সাথে কথা বলুন..... ১১৩
চাঁদের কাছে প্রতিজ্ঞা করুন..... ১১৫
কারও দিনকে রাঙিয়ে দিন..... ১১৭
সার্কেল গেম খেলুন..... ১১৯
জেগে উঠুন..... ১২১
বাবা-মা'কে দোষারোপ করবেন না..... ১২২
ইতিবাচক সবকিছুতে নজর দিন..... ১২৩
নিজেকে জানুন..... ১২৫
কখনোই হতাশ হয়ে হাল ছাড়বেন না..... ১২৬
জোরপূর্বক মনকে কাজে ন্যস্ত করুন..... ১৩০
কল্পনাতেই নিহিত জগৎ..... ১৩১
রসিকতায় দূর হয় অন্ধকার..... ১৩৩
সার্ভ এন্ড গ্রো রিচ..... ১৩৪
অর্জনগুলোর তালিকা তৈরি করুন..... ১৩৭
মূল লক্ষ্যে অটুট থাকুন..... ১৩৯
শুরুতে নিজেকেই পরিবর্তন করুন..... ১৪০
লক্ষ্য অর্জনে নিয়মিত কাজ করুন..... ১৪৩
না শব্দটিকে প্রশ্নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করুন..... ১৪৪
নিজেকে কোথাও নিয়ে যান..... ১৪৫
নেতিবাচক চ্যানেল/পেপার এড়িয়ে চলুন..... ১৪৬
দুশ্চিন্তায় লাভ কী?..... ১৪৭
চিন্তাশীল মানুষদের সাথে চলুন..... ১৪৮
জীবন উপভোগ করতে শিখুন..... ১৪৯
অবিরাম পথ চলতে থাকুন..... ১৫০
প্রচুর রহস্যোপন্যাস পড়ুন..... ১৫২
আপনার জীবনাচরণ স্পষ্ট করুন..... ১৫৩
শক্তি ও দুর্বলতার জায়গা চিহ্নিত করুন..... ১৫৪
আপনি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী..... ১৫৫
আপনার লক্ষ্য সম্প্রসারণ করুন..... ১৫৬
রোলমডেল তৈরি করে নিন..... ১৫৭
স্বপ্নের ফলাফলই সাফল্যের পরিচায়ক..... ১৬০
জ্ঞানলাভের কাজে সময় দিন..... ১৬৩
নৈতিকতা বর্জন করা উচিৎ নয়..... ১৬৪
নিজেকে গল্পের মতো পড়ুন..... ১৬৫

প্রচুর হাসুন.....১৬৬
আমি একটা কাপুরুষ ১৬৭
গর্জে উঠুন.....১৭০
এক্সপেরিম্যান্ট উইথ হ্যাপিনেস.....১৭১
নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিন ১৭২
মহান মানুষের বার্তা অনুসরণ করুন.....১৭৪
নিজের মাঝে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখুন.....১৭৫
রেসপন্স করুন, রিঅ্যাকশন দেখাবেন না ১৭৬
আপনি যে বইটি পড়েছেন তা প্রয়োগ করুন.....১৭৭
প্রতিদিনই কিছু কাজ করুন লক্ষ্য পূরণে ১৭৯
ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করুন ১৮১
চিন্তাভাবনাকে ইতিবাচক সহায় দিন.....১৮২

ভূমিকা

বব ডিলান তার বইয়ের ভূমিকায় জোয়ান বেজের ব্যাপারে লিখেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন 'কীভাবে তিনি জোয়ানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন তার সাথে দেখা করা পূর্বে'। কিন্তু তিনি জোয়ানের সাথে দেখা করার সাহস করে উঠতে পারেননি তখন। এ ব্যাপারে বব ডিলান বলেছিলেন—'আমি জোয়ানের সাথে দেখা করতে ভয় পাচ্ছিলাম। এটা কেন হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। চাচ্ছিলাম না তার সাথে দেখা করতে, যদিও আমি জানতাম আমার সাথে তার দেখা হবেই। জোয়ানের মাঝে উজ্জীবিত বলয়ের শক্তি ছিল, এবং আমি নিজেও এই শক্তিটুকু অনুভব করতে চেয়েছি, করে যাচ্ছিলাম। কোনো অসাধ্য সাধন করার জন্য ভেতরে যতটুকু আগুন থাকা লাগে, তার পুরোটাই নিজের ভেতর ধারণ করার চেষ্টা করেছিলাম।'

বেশ, আমরা আসলেই জানি না বব ডিলান এখানে আগুন বলতে সুস্পষ্টভাবে কী বোঝাতে চেয়েছেন। তবে আমরা বিষয়টি এমনভাবেই অনুধাবনের চেষ্টা করি, যেন আমরা আসলেই বব ডিলানের উপলব্ধি ধরতে পেরেছি। তবু মাঝেমধ্যে নিজের মনের মাঝে প্রশ্ন জাগে—আসলেই আমরা পেরেছি? আমরা কি বব ডিলানের আগুনের কথাটির আসল ব্যাখ্যা বের করতে পেরেছি? এটা বের করার জন্য আমাদের কি গায়ক বা সাহিত্যিক হওয়া জরুরি? আমরা কি ডিলানের কথাটির সঠিক ব্যাখ্যানুসারে নিজেদের একটি রাস্তা দেখাতে সক্ষম? এমন প্রশ্ন জাগাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আমি আপনাদের বলতে চাই, মনের মধ্যে এ ধরনের যেকোনো প্রশ্ন থাকলে সেসব চাপা দিন। কেননা, বব ডিলানের আগুন শব্দটির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বের করা কঠিন কিছু নয়। তিনি জোয়ানের সামনে যাওয়ার প্রসঙ্গে যেই তেজস্বীতার কথা উল্লেখ করেছেন কিংবা অগ্নিপরীক্ষার কথা, আমাদের সবার জীবনেই এটা রয়েছে। সবার ভেতরে রয়েছে। যাপিত জীবনের নানা ছোটখাটো কিংবা বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আমরাও এটা উপলব্ধি করে থাকি।

আমার জীবনের সবচেয়ে টার্নিং পয়েন্ট ছিল নিজের ভেতরের এই আগুন বুঝতে পারা, এটি ব্যবহার করে জ্বলে ওঠা। যদিও আমার এসব বুঝতে বুঝতে ততদিনে বেশ সময় লেগে গিয়েছিল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর আমি নিজের ভেতরে থাকা অগ্নিশিখা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কোনো সন্দেহ নেই আমি এইদিক দিয়ে ধীরগতির। তবে আপনি চাইলে আজই নিজের মাঝে সেই অগ্নিশিখা আবিষ্কার করে নিজেকে সেরা জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম। আমার জীবনের প্রথম পঞ্চাশটি বছর কেটে গিয়েছিল সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে তোলার কাজে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে এত সময় লাগবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা, নিজের শক্তি আবিষ্কারের বিষয়ে বিভিন্ন

ধরনের উপলব্ধি হাজির থাকবে আপনার সামনে, যেগুলো বাস্তব জীবন থেকেই তুলে ধরা হবে। পঞ্চাশ বছর কেটে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমাকে জ্বলে উঠতে হবে। আমার সাথে কিছু একটা ঘটছে, যেটি ঘটতেই হতো আমার জীবনকে আরও সুন্দর একটি স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর আমি বিশ্বাস করি এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পথচলার অভিজ্ঞতার ফলেই পরিবর্তন এসেছিল আমার জীবনে। আমি যা জানতাম সেসবই নতুন ভীত রচনা করেছে। আপনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটবে। আপনি নিজে যা জানেন সেসব নিয়েই তো আপনার জীবন পরিচালনা করবেন, তাই না?

একটা মজার বিষয় হচ্ছে, আগুন জ্বালানোর জন্য সবসময়ই আগুনের প্রয়োজন হয়। আপনি চাইলেও সুনির্দিষ্ট কিছু জ্বালাতে পারবেন না, যদি আগুনের সুব্যবস্থা না থাকে। তেমনই আপনার জীবনেও নিজেকে বেশি ওপরে নিতে পারবেন না, যদি ভেতর থেকেই আগুন না থাকে। আমি একবার আগুন জ্বালানোর জন্য ফায়ারপ্লেসে গেলাম। আমার হাতে ছিল সংবাদপত্রের কিছু কাগজ। সাথে কিছু কাঠও নিলাম। উদ্দেশ্য—আগুন ধরানো। কিন্তু এত সব থাকার পরও আমি আগুন ধরাতে পারলাম না। কেন? কারণ, আপনিও যদি আগুন ধরাতে যান, জ্বালানোর সকল উপাদান একসাথে করলেও আপনার দরকার হবে একটি ম্যাচ, অথবা একটি লাইটার। ম্যাচ কিংবা লাইটার আপনার কাছে থাকলে তবেই আপনি আগুন ধরাতে পারবেন। তার মানে আগুন জ্বালাতেও আগুনের প্রয়োজন পড়ছে, ব্যাপারটা আয়রনিক্যাল? নাকি নিখাদ প্যারাডক্স?

একবার এক বন্ধু আমাকে বলেছিল, 'ইউ আর অন ফায়ার!' এই ফায়ার তথা আগুনের কথা বলার মানে কী আসলে? আমি আগুন জ্বালাচ্ছি? কিংবা আগুনে জ্বলে যাচ্ছি? একেবারেই না। বন্ধুকে আমি বিভিন্ন ধরনের বই, লিখিত পাণ্ডুলিপি, রেকর্ডেড অডিও বিক্রি করার দুরন্ত সব আইডিয়া দিচ্ছিলাম। এছাড়াও নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নানাবিধ তরিকা তাকে জানাচ্ছিলাম। এজন্যই সে আমাকে ওপরের কথাটি বলেছিল। তো আমি কীভাবে নিজেকে আগুনের মতো (রূপকভাবে) জ্বলে উঠতে সক্ষম করে তুলেছি? এক কথায় বললে, আগুনের ব্যবহার করার মাধ্যমেই।

মানুষের জীবনের একটি কাজ অপরটিকে প্রভাবিত করে থাকে। একটি কাজের ফলাফল নির্ধারণ করে থাকে আরেকটি কাজ। আমি কখনোই নিজের কাজকে ভয় পেতাম না। সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতাম এবং কাজ শুরু করতাম। আমি সবসময়ই কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলাম। কাজের মাঝে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সময় নষ্টকারী বিষয়গুলোকে প্রশ্রয় না দিয়ে বরং কাজে ডুবে থাকতাম। নিয়মিতই নানা বিষয় অনুশীলন করতাম। শরীরচর্চা করতাম। আর এভাবেই যদি আপনিও নিজের কাজ করতে থাকেন, তাহলে দেখবেন একটা সময় কাজের প্রতি বিরক্তি আসবে না; বরং আপনার কাজ হয়ে উঠবে আনন্দের ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নোয়েল কাওয়ার্ডের একটি কথা আমার বেশ ভালো লাগে। তিনি বলেছিলেন, "কাজ হচ্ছে আনন্দের চেয়েও বড় আনন্দের বিষয়।"

আর এমনটা তখনই ঘটবে, যখন আপনি নিয়মিত কাজ করবেন। আপনি যদি কাজ না করে বসে থাকেন, তাহলে কখনোই কাজের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না। বিশেষ করে আপনি কাজ না করে যদি কাজ নিয়ে ভাবতে থাকেন, তবু কাজের আনন্দ খুঁজে পাবেন না।

আগুন ধরাতে হলে শুরুতেই আপনাকে আগুনের ব্যবহার করতে হবে। দুটি শুকনো কাঠি কিংবা পাথর একসাথে করে ঘষলে সেখান থেকে একসময় যথেষ্ট শিখা বের হওয়া সম্ভব। এই শিখা থেকেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে বিশাল আগুন।

একই কথা আপনার জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনাকে ছোট ছোট অপশন থেকে শুরু করতে হবে। ছোট ছোট কাজ করতে হবে। পূরণ করতে হবে ছোট ছোট টার্গেট। নিয়মিতই নিজের কাজ করে যেতে হবে। এভাবেই দেখা যাবে একসময় আপনি কাজের আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি কাজ করার মন মানসিকতা তৈরি করতে পারছেন? আপনি কি পাথর কিংবা কাঠি ঘষার মতোই ধীরে ধীরে নিজের কাজ এগিয়ে নিতে পারছেন? একেবারেই নিজের মতো করে আপনি নিজের কাজগুলো সম্পন্ন করতে সক্ষম? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা এবং আপনাকে কাজের দিকে ধাবিত করার জন্যই বইটি আপনাকে সহায়তা করবে।

১৯৯৬ সালে বইটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম মুদ্রণের পর থেকেই বইটির আশাতীত সফলতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এমনকি আমি কল্পনাও করতে পারিনি এতটা সাফল্য পাবে, বইটির এতটা বিস্তৃতি ঘটবে। চারদিকে অগণিত মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বইটি। মুদ্রিত হওয়ার পরের আঠারো বছরের বিক্রি চলাকালীন সময়ে ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসার ঘটতে দেখেছি আমি। এসময় বইয়ের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ কনটেন্ট লেখা হচ্ছিল। একটা সময় ছিল যখন বই মানুষের জ্ঞান আহরণের সবচেয়ে সহজলভ্য মাধ্যম ছিল, কিন্তু ইন্টারনেটের গতিশীল যুগে এসে অনেক কিছুই বদলে যায়। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, ঐ সময়ও আমি বিভিন্ন সাইটে মানুষকে বইটির রিভিউ নিয়মিতই পোস্ট করতে দেখছিলাম। বইটির বিক্রিও এসময় থেমে থাকেনি। মানুষ বইটি পড়ছিল, তাদের থেকে আসছিল নানারকম রিভিউ। আমি বুঝতে পারছিলাম বেশ হেল্পফুল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বইটি। সবচেয়ে ভালো লাগছিল এটা দেখে যে, বইয়ের দোকানগুলো পেশাদার সাংবাদিক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মানুষের বাইরেও সাধারণ সব মানুষের রিভিউ প্রদর্শন করছিল সবার সামনে। ফলে বইটি মানুষের আকাঙ্ক্ষার জায়গা নিতে সক্ষম হয়।

'১০০ উপায়...' নিয়ে সাধারণ মানুষের এমনই এক রিভিউ আমার নজরে এসেছিল ফার্স্ট এডিশনের বিক্রি চলাকালীন সময়ে। লোকটির নাম ছিল বুবা স্পেন্সার।

তিনি নিজের রিভিউয়ে লিখেছিলেন, 'জটিল কোনো তাত্ত্বিক পাঠ ছাড়াই বেশ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করে বইটিতে জানানো হয়েছে আপনার জীবন কীভাবে উন্নত করতে চান' সেই প্রসঙ্গে। রয়েছে অনুপ্রেরণা নিশ্চিত করার সহজ টিপস। আপনি যদি সত্যি সত্যিই জীবন উন্নত করতে চান, তাহলে এটি আপনার জন্য একটি মাস্ট রিড বই।'

বুবা আমার বইটির রেটিংয়ে ফাইভ স্টার দিয়েছিল। একজন পেশাদার রিভিউয়ারের চেয়েও আমি তার কাছে বেশি কৃতজ্ঞ। তিনি আরও বলেছিন, বইটি পড়ার পর আমার যা করার আমি মূলত সেটাই চেষ্টা করতে চলেছি।

'সহজ কাজ জটিল করে ফেলাটা বেশ কমন ব্যাপার। কিন্তু জটিল কাজ সহজ, সবচেয়ে সহজ করে সম্পন্ন করাটাই সৃজনশীলতা।'—চার্লস মিঙ্গাস, কিংবদন্তী জ্যাজ মিউজিশিয়ান

১
মৃত্যুকে স্মরণ করুন

বেশ কয়েকবছর আগের কথা। আমি তখন সাইকোথেরাপিস্ট ডেভারস ব্রান্ডেনের সাথে কাজ করছিলাম। তিনি আমাকে ডেথবেড নামক একটি এক্সপেরিমেন্টের মুখোমুখি করেছিলেন।

তিনি আমাকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকার মুহূর্তটি কল্পনা করতে বললেন। আমি শুয়ে আছি। আমাকে একদম মৃত্যুর আগ মুহূর্তের কথা স্মরণ করতে বললেন ডেভারস। বিদায় আসন্ন। আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। আমাকে চলে যেতে হবে সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, অন্য এক জগতে, যেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসে না। এমন অনুভূতি নিজের মাঝে সঞ্চার করতে নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপর কল্পনায় আমাকে দেখতে আসার জন্য বন্ধু ও আত্মীয়দের আমার কাছে আসার আমন্ত্রণ জানাতে বললেন। তারা এলো। আমি শক্তিহীন, বিবর্ণ। আমার বন্ধুরা কাছে আসছে। আত্মীয়রা কাছে আসছে। তাদের দেখে আমার চোখ ভিজে গেল। আমি চিৎকার করে তাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি, কিন্তু পারছি না। কোনোরকমে সবাইকে জানাতে চেষ্টা করলাম বিদায়বেলায় আমি কী চাই। আমার কল্পনাতেই আমি সবার সাথে যোগাযোগ করলাম।

প্রতিটি মানুষের সাথে কথা বলার সময় আমার ভেতর শেষ হয়ে যাচ্ছিল, জড়তা এসে যাচ্ছিল বারবার আমার কণ্ঠে। আমি কোনোভাবেই চোখের জল আটকাতে পারছিলাম না। আমি শোকে মূহ্যমান হয়েছিলাম। সত্যি সত্যিই এটা ছিল এমন ভালোবাসার মুহূর্ত, যা পূর্বে আমি কখনোই দেখতে পাইনি।

ঐ এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সবকিছুই আমার সত্য বলে মনে হচ্ছিল। আমার কাছে একবারের জন্যও মনে হয়নি আমি এসব কল্পনা করছিলাম। সবকিছুই স্পষ্ট আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমার শৈশব-কৈশোর, বন্ধুদের সাথে আনন্দের মুহূর্ত, পরিবারের সাথে কাটানো সময়—সবই আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি তখনো সুস্থ, কিন্তু ডেথবেড এক্সপেরিমেন্টের পুরোটা সময়জুড়ে নিজেকে মৃত্যুশয্যায় থাকা একজন মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল নিজেকে। আর পুরো ব্যাপারটাই ছিল গভীর অনুভূতির। আমি সবকিছু নিয়ে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। জীবন, সম্পর্ক, বন্ধু, আত্মীয় সময়ের গুরুত্ব সব আমার মনের মাঝে ধরা দিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার জীবনে কী গুরুত্বপূর্ণ, আমার জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কোন কোন বিষয় আমার জীবনে মেনে চলা উচিত সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য।

এরপর থেকে আমি জীবন একেবারে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আগের মতো আর জীবন কাটাইনি। ভালো কোনো মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ এলে ছাড়তে চাইনি। কোনো কথা আমি না বলা রাখতে চাইনি, বলে দিয়েছি। কোনো ভালো কাজ করার অপশন এলে করেছি। নীতিগতভাবেও নিজের জীবন আরও সুসংহত করে নিয়েছিলাম।

জীবনকে করে নিয়েছিলাম ক্ষুদ্র। যেকোনো সময় আমার মৃত্যু হতে পারে—এই কথাটি সবসময়ই মনে রাখতাম। এটাই আমাকে আরও সুন্দর একটি জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আমি স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলাম সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য আমাকে কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে বাঁচতে হবে। জর্জ প্যাটন একটা কথা বলেছিলেন, মৃত্যু এমনকি জীবনের চেয়েও বেশি এক্সাইটিং হতে পারে। এই কথার মর্ম ঐ এক্সপেরিমেন্টের পরপরই আমি প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কল্পনা করা, মৃত্যুর কথা স্মরণ করা একজন মানুষের জীবনকে অনেক পরিবর্তন করে দিতে পারে। ডেভারস ব্রানডেনের এক্সপেরিমেন্ট আমাকে এটাও শিখিয়েছিল। আমরা চাইলে জীবনে অনেক ভালো ভালো অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারি। চাইলে মুহূর্তগুলো সবচেয়ে উত্তম করে তুলতে পারি। এই শিক্ষাটাও ডেথবেড এক্সপেরিমেন্ট আমাকে দিয়েছিল।

এর ঠিক কয়েক বছর আগের কথা। আমার মা তখন হাসপাতালে ভর্তি। টিউসনের একটি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। তার বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সকলেই তাই মনমরা হয়েছিল। মায়ের এমন অবস্থায় আমার হাল আরও খারাপ ছিল। আমি তার পাশে থেকেছি হাসপাতালে। প্রতিটি মুহূর্ত সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। এমন অন্তিম সময়ে এসে তিনি যেন কোনোরকম কষ্ট না পান, সেই চেষ্টা করেছি। আমি তার হাত ধরেছি। ভালোবাসা প্রকাশ করেছি। তাকে জ্ঞাপন করেছি কৃতজ্ঞতা। তিনি আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন। তার জন্যই আমি বড় হতে পেরেছি। স্বাভাবিকভাবেই একজন মা তার সন্তানকে লালনপালনের জন্য যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। আমার মা-ও এসবের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও আমার বড় হওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই কথাগুলো আমি তাকে বারবারই বলছিলাম। আমার মা-ও নিজের সকল অনুভূতি আমাকে জানাচ্ছিলেন। আমি তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম, তিনি বলছিলেন। হাসপাতালে সময়গুলো এভাবেই কাটল। মা'র অবস্থার অবনতি ঘটল। বুঝলাম আর বেশি দিন হয়তো তিনি থাকবেন না। এবং সেটাই ঘটল। একদিন মা আমাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। এমন জায়গায় তার গন্তব্য হলো, যেখান থেকে কখনোই ফিরে আসা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আমি একদম মুষড়ে পড়লাম। পুরো পৃথিবী অন্ধকার মনে হচ্ছিল। আমি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে হয়ে উঠেছিলাম একাকী পাখি। মায়ের চলে যাওয়া আমার মনের ওপর গভীর দুঃখের সূচনা করেছিল। তবে এটি বেশি দিন ছিল না। আমার কাছে মনে হলো খুব অল্প সময়ের ভেতর সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। এর পেছনের কারণ হচ্ছে, মাকে নিয়ে আমার যত স্মৃতি, যত কথা, সবই আমি মায়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম হাসপাতালে থাকার সময়। এই বিশদ ভালোবাসার মুহূর্তগুলো আমার মনের মাঝে সেট হয়ে গিয়েছিল। আমার মা আমার মাঝে বেঁচে গিয়েছিলেন এই স্মৃতির জন্যই। তাই একটা সময়ের পর আমার কষ্ট থাকেনি। সত্যি বলতে আমি চিন্তাই করতাম না যে মা আর নেই।

এভাবে দিন কাটতে লাগল। আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেলাম। নিজের সকল কাজ করতে থাকলাম। কিন্তু মানুষের জীবনে বিপত্তি ঠিক একবার আসে না, বারবার আসে। আমার জীবনেও এটাই ঘটল। মায়ের মৃত্যুর ঠিক দেড় বছর পর বাবাও একদম অসুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি পূর্ব থেকেই নানারকম অসুখে ভুগছিলেন। দুরারোগ্য রোগ

তাকে শেষ করে দিচ্ছিল। তাই তার সাথে যোগাযোগ করা খুব একটা সম্ভব ছিল না। এজন্য বিকল্প পদ্ধতি খুঁজতে শুরু করলাম। তাকে নিয়ে চিঠিপত্র লেখা শুরু করলাম। একের পর এক চিঠি লিখলাম বাবাকে। আমার জীবনে বাবার সকল অবদান স্বীকার করে আমি সেসময় চিঠি লিখেছিলাম। মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন সময়ে আমার বাবার দিন কাটছিল আমার লেখা চিঠি পড়ে। আমি তাকে উপহার দিচ্ছিলাম স্মৃতিময় কথা, আমি জানাচ্ছিলাম তাকে ঘিরে আমার সকল অনুভূতির কথা। আমি বুঝতে পারছিলাম এসব তাকে বেশ ভালো বোধ করাচ্ছিল। এমনকি আমি তাকে নিয়মিত কবিতাও লিখে পাঠাচ্ছিলাম। এসব পড়ে একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন—"আমি আসলে অতটাও খারাপ বাবা ছিলাম না।" কথাটি তিনি আনন্দের সাথে বলেছিলেন। আমি নিশ্চিত নিজেকে নিয়ে তার গর্ব হয়েছিল। বাবা হিসেবে তিনি সফল, এটা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। আমার মূলত এটাই চেষ্টা ছিল। বাবা যেন অন্তিম মুহূর্তে এসে কোনোরকম আক্ষেপে না থাকেন, কোনো হতাশা যেন তাকে ছুঁতে না পারে, এ ব্যাপারে আমি সচেষ্ট ছিলাম। তাই আমি নিজের সকল অনুভূতি জানিয়ে দিয়েছিলাম চিঠিপত্র ও কবিতার মাধ্যমে।

উইলিয়াম ব্লেকের একটা কথা আমার বেশ ভালো লেগেছিল। তিনি আমাদের ভাবনাগুলো বন্দি রাখতে নিষেধ করেছিলেন। আমাদের সতর্ক করেছিলেন, যাতে কখনোই নিজেদের অনুভূতিগুলো নিজের ভেতরই না রেখে দিই। এই কাজ করাটা মোটেই ভালো কোনো বিষয় নয়। "যখন চিন্তাকে বন্দি করা হবে, তখন ভালোবাসা ডালপালা ছড়াবে দোজখের মতো, অবতীর্ণ হবে ঘৃণার ভূমিকায়।" বলেছিলেন তিনি।

মৃত্যু আমাদের জীবনের অসাড়তা স্মরণ করায়। আমাদের জানায় প্রতিটি মুহূর্তকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য। বলে দেয় জীবনকে মহৎ করে তোলার কথা। মৃত্যুর মুহূর্ত স্মরণ করেই আমরা প্রতিটি মুহূর্তের জন্য বাঁচতে পারি। এমনকি এতে আমাদের মনের মধ্যে থাকা সকল হতাশাও দূর হয়ে যাবে। কোনোরকম অন্ধকার আমাদের মনে থাকবে না। মৃত্যুর অনুভূতি আপনাকে শেখায়—আপনাকে বাঁচতে হবে প্রতিটি দিনের জন্য, প্রতিটি ঘন্টার জন্য, প্রতিটি মিনিট ও সেকেন্ডের জন্য। একেকটা মুহূর্ত আমাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, মৃত্যুর মাধ্যমে অস্থায়ী জীবনের সমাপ্তিটাই আমাদের তা মনে করিয়ে দিতে সক্ষম। তবু আমরা অনেকেই আছি, যারা ভাবি, জীবনের কোনো শেষ নেই। অনেক বললে ভুল হবে, সব মানুষের ভেতরই এই চিন্তা কাজ করে থাকে যে, আমরা কখনোই মরব না। মৃত্যুর সময় আসন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মনে এমন ধরনের চিন্তা চলতেই থাকে। এমনকি আমি নিজেও এ ধরনের মানুষের ভেতরই পড়ি। আর এজন্যই আমরা নিজেদের জন্য কাজ ঠিক করি, ফিউচার গোল সেট করি, আশা করি। এজন্যই আমাদের বলতে শোনা যায় "একদিন আমি ঐ কাজটা করবো", "ঐ জিনিসটা একদিন আমি অর্জন করব"। আমরা একটি কল্পনার ভূমিতে নিজেদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যগুলোকে স্থান দিয়ে জীবন পথে এগোতে থাকি। সাইকোলজি অব উইনিং বইয়ে জেমস ওয়েটলি ঠিক এই বিষয়টিই আমাদের জানিয়েছিলেন।

তবু আমি সবাইকে বলতে চাই, মৃত্যুকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। মৃত্যুকে ইতিবাচকভাবে নিতে শিখুন। এই পৃথিবী একদিন আমাদের ছাড়তে হবে। এটা মনে করে হলেও জীবনকে দারুণ একটা স্তরে নিয়ে যান। অস্থায়ী এই জীবন একদিন নিশ্চিতভাবেই শেষ হবে। তাহলে কেনই-বা হতাশা নিয়ে নিজেকে শেষ করে দেবেন? হতাশ হওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই মূলত আমাদের হাতে নেই।

২
আকাঙ্ক্ষা বজায় রাখুন

আরনল্ড শোয়ার্জনেগারের নাম শোনেনি এমন মানুষ কমই রয়েছে। এই বিখ্যাত ব্যক্তি নিজের কর্ম দিয়ে বহু মানুষের মনে জায়গা দখল করে নিয়েছেন। কিন্তু আমি এখন যেই সময়ের কথা বলতে চলেছি, তখন তিনি আজকের মতো এত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিলেন না। এমনকি কেউ তাকে চিনত না। আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার কোথাও গেলে তাকে ঘিরে মানুষের যত ভীড় হতো, সেটাও ঐ সময় ছিল না। ১৯৭৬ সাল। হ্যাঁ, আমি তখনকার কথা বলছি। অ্যারিজোনার টিউসনের ডাবলট্রি ইন-এ আমরা দুজন একসাথে লাঞ্চ করার জন্য বসেছিলাম। ঐ সময় হোটেলের একজন ব্যক্তিও তাকে চিনত না। তিনি তখন নিজের স্টে হাংরি চলচ্চিত্রটির প্রচার করার জন্যই কাজ করে যাচ্ছিলেন, যদিও স্যালি ফিল্ড ও জেফ ব্রিজেসের সাথে করা সেই চলচ্চিত্রটি বক্সঅফিস ফলাফল ছিল একদম হতাশ করার মতো। সবমিলিয়ে শোয়ার্জনেগারের বলার মতো কোনো পরিচিতি ছিল না। আর আমি তখন টিউসন সিটিজেনের স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছিলাম। আমার পত্রিকার অফিস থেকে শোয়ার্জনেগারের ওপর একটি ফিচার লিখতে বলা হয়েছিল। শোয়ার্জনেগারের সাথে পুরো একটি দিন বসে থেকে তার সকল কথা নোট করার নির্দেশ পেয়েছিলাম আমি। আমাদের পত্রিকার রবিবারের ম্যাগাজিনের ফিচারটি ছাপা হওয়ার কথা জানানো হয়েছিল আমাকে। আমি নিজেও জানতাম না শোয়ার্জনেগার আসলে কে এবং পরবর্তী সময়ে সে কোন অবস্থানে যাচ্ছিল। তবু আমাকে তার কাছে যেতে হয়েছিল। কারণ, এটি ছিল আমার এসাইনমেন্ট। তো আমি যদিও একটু নেতিবাচক মোড নিয়েই সেই রিপোর্ট করতে গিয়েছিলাম, এটি আমি কখনোই ভুলতে পারব না। কোনো সন্দেহ নেই যে, দারুণ একটি সাক্ষাৎকার ছিল সেদিন।

ঐদিন আমি শোয়ার্জনেগারকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। একের পর এক প্রশ্ন করে তথ্য নিয়েছিলাম। তবে দুজনের আলাপে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মুহূর্ত এসেছিল এক ঘন্টার জন্য লাঞ্চে অংশ নেবার সময়। আমরা তখন টেবিলে বসলাম। সামনেই রাখা ছিল আমার নোটবুক। খেতে খেতেই আমাদের আলাপ চলছিল। একসময় আমি ক্যাজুয়ালি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"এখন তো আপনি বলিবিল্ডিং ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর কী করবেন?" আমার কথা তার জন্য হতাশার হতে পারত। হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। বক্সঅফিসে তার অবস্থান ভালো ছিল না। চলচ্চিত্র ব্যবসা করতে পারছিল না। এমনকি বলার মতো পরিচিতিও ছিল না। বডিবিল্ডিং তার জন্য বেশ ভালো জায়গা ছিল। আমার প্রশ্ন অন্তত পরোক্ষভাবে তাকে চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিল। হয়তো তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন। তবে তিনি একদম শান্ত রইলেন। তার চেহারার কোনো ভাবান্তর হলো না। শান্ত কণ্ঠেই বললেন—"আমি হলিউডের নম্বর ওয়ান বক্স অফিস স্টার হতে চলেছি।"

এটা শোনার পর তৎক্ষণাৎ আমার বিস্মিত হওয়ার কথা ছিল। হয়েছেও তাই। বক্স অফিসে একদম হতাশ করা একজন ব্যক্তি নিজেকে নম্বর ওয়ান বক্স অফিস স্টার হিসেবে জায়গা করে দিতে চলেছে, এটা মানতে কিছুটা হলেও কষ্ট হয়। অন্তত সেই সময়ে শোয়ার্জনেগার তেমন ছিলেন না। তবে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়—আপনারা তা জানেন। বর্তমানে শোয়ার্জনেগারের অবস্থান তো কারও অজানা নয়। তিনি নিজেকে সেরা জায়গায় নিয়ে গেছেন। নিজেকে নিয়ে তিনি যা ভাবতেন, সেটা তিনি করে দেখিয়েছিলেন। আমি যেই সময়ের কথা বলেছি, তখন কেউ তাকে চিনত না। কিন্তু এখনকার সময় ভিন্ন। শোয়ার্জনেগারকে চেনা মানুষ সারাবিশ্বেই রয়েছে। শোয়ার্জনেগার নিজের কথা বলেই বসে থাকেননি। নিজের কথাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গেছেন তিনি। নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। একটা সময় সফলতার মুকুট তার নিজের হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কীভাবে তিনি এটা করতে সক্ষম হয়েছিলেন? এটা তার পরবর্তী কথাগুলোর মাঝেই নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন তিনি, যদিও ঐ সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়ও তিনি প্রান্তিক স্তরের একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কী ছিল তার সেই কথা, যা তিনি নিজেকে নম্বর ওয়ান বক্স অফিস স্টার বানানোর পথে করবেন বলে আমাকে জানিয়েছিলেন? বলছি তাহলে, শুনুন। তার নম্বর ওয়ান বক্স অফিস স্টার হওয়ার কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা তাকে লক্ষ্য করতে দিইনি। কোনোরকমে নিজের বিস্ময় সামলে আমিও শান্তস্বরেই তাকে ফের জিজ্ঞেস করেছিলাম—"বেশ, আপনি কীভাবে নিজেকে নম্বর ওয়ান বক্স অফিস স্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন? আপনার পরিকল্পনা কেমন?" শোয়ার্জনেগার তখন আমাকে বলেছিলেন—"তেমন কিছু নয়। আমি ঠিক সেটাই করব, যেটা একজন বডিবিল্ডার হিসেবে করতাম। বড় হওয়ার জন্য আপনাকে শুধু আপনি যা হতে চান, তেমন একটি চিত্র মনের মাঝে ধারণ করে নিতে হবে। তারপর সেই চিত্র অনুযায়ী জীবন কাটাতে হবে, যেন তা ইতোমধ্যেই সত্য হিসেবে আপনার জীবনে আবির্ভূত হয়েছে।"

শোয়ার্জনেগার ঠিক এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই জীবন এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন। তিনি যা হতে চাইতেন, সেটির ক্ষুধা তার ভেতরে ছিল। নিজের মাঝে নিজের স্বপ্নের ছবি তৈরি করে নিয়েছিলেন শোয়ার্জনেগার, যা তাকে অনেক বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল পরবর্তী সময়ে। এবং বর্তমানে আপনারা তার অবস্থান সম্পর্কে জানেন। এমনকি আমি সেই মুহূর্তের কথা আজও ভুলতে পারি না যখন একটি এন্টারটেইনমেন্ট শো'তে টারমিনেটর চলচ্চিত্রের জন্য আরনল্ড শোয়ার্জনেগারকে সবচেয়ে সেরা বক্স অফিস স্টার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। শোয়ার্জনেগার নিশ্চিতভাবেই কথা রেখেছিলেন নিজের, করে দেখিয়েছিলেন তিনি। এমন কিছু আপনার সাথেও ঘটতে পারে, যদি আপনারা চেষ্টা করেন। আরনল্ড শোয়ার্জনেগারের কথাগুলো জটিল কিছু নয়। তিনি একদম স্পষ্ট কথা বলেছিলেন। এসব কথা নিয়ে কারও মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বও জাগার কথা নয়। সত্যি বলতে, মনের মাঝে স্বপ্নকে চিত্র আকারে জায়গা করে দিতে হবে। শোয়ার্জনেগারের ভিশন ক্রিয়েটিং সিস্টেম একটি মোটিভেশনাল টুল। নিজেকে মোটিভেট করার জন্য এই টুল বেশ কার্যকরী। সময়ে সময়ে আমি বহু সেমিনারে অংশ নিয়েছি। বহু জায়গায় আমি কথা বলেছি, প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এসব প্রশিক্ষণে ঘুরেফিরেই স্বপ্ন সৃষ্টির কথা

উল্লেখ করেছি আমি। সবসময়ই মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি মনের ভেতর স্বপ্ন নিয়ে চিত্র তৈরি করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে একটি ক্যারেক্টার নির্মাণ করতে হবে। ঐ ক্যারেক্টারের যত সাজসজ্জা, স্বভাব আপনাকে মেনে চলতে হবে। শুধু তাই নয়, নিজেকে ঐ ক্যারেক্টার হিসেবে বাস্তব জগতে জায়গা করে দেওয়ার জন্য কাজ করে যেতে হবে। আপনি যত বেশি কাজ করতে পারবেন, তত বেশি সফলতা আপনাকে ঘিরে আসতে থাকবে। শোয়ার্জনেগার কেবল নিজেকে একজন নম্বর ওয়ান বক্স অফিস স্টার হিসেবেই ভেবে বসে থাকেননি। নিজেকে সেই জায়গায় নেওয়ার তিনি জন্য সবরকম চেষ্টা করে গেছেন। নম্বর ওয়ান বক্স অফিস স্টারের যেই ক্যারেক্টার তিনি মনের মাঝে চিত্রের সাহায্যে তৈরি করেছিলেন, সেটি বাস্তবায়নের ক্ষুধাই একসময় তাকে সফলতা এনে দিয়েছিল। আপনিও জীবনে এমন কিছুর জন্য ক্ষুধা রাখুন। নিজেকে মোটিভেট করতে এবং সফলতা আদায় করে নেওয়ার জন্য এই ক্ষুধা থাকাটা জরুরি।

৩
উপযোগী মিথ্যার ব্যবহার করুন

আমার মনে আছে, আমার বারো বছর বয়সী মেয়ে একবার স্কুলে একটি কবিতা পাঠের আয়োজনে অংশ নিয়েছিল। স্কুলকর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীদের একটি করে কবিতা লিখতে বলেছিল। তারা কতটুকু বড় হতে চায় কিংবা তারা কতটুকু বড়, এসব নিয়ে কল্পনা করে একটি মিথ্যাপ্রসূত কবিতা লিখতে বলা হয়েছিল। এই কবিতার মাঝে থাকবে নানা ধরনের মিথ্যার আশ্রয়। এই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াটা সিরিয়াস কোনো ইস্যু নয়। এটা শিক্ষার্থীদের মনের আকাঙ্ক্ষা বের করে নিয়ে আসার জন্যই করা হয়েছিল। ঐ আয়োজনের ভেতর দিয়েই স্কুলকর্তৃপক্ষ বহু শিক্ষার্থীর মনের কে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিল। শিক্ষার্থীরা সবাই একেকরকম কবিতা লিখেছিল। একেকজন একেক মানুষের মতো হতে চেয়ে কবিতা লিখে নিয়ে এসেছিল। আমি সেসব লেখার মাঝে শোয়ার্জনেগারের চিত্র তৈরির বিষয়টি দেখতে পেয়েছিলাম। শোয়ার্জনেগার নিজের ভবিষ্যত নিয়ে চিত্র তৈরি করেছিলেন। স্কুলের শিক্ষার্থীরাও শোয়ার্জনেগারের মতো করেই সবকিছু চিন্তা করেছিল। তারা নিজের কতটুকু বড় মাপের ব্যক্তিত্ব এসব নিয়ে মনের মাঝে চিত্র তৈরি করে খাতায় কবিতা লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিল। প্রতিটি শিশুই সেদিন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার জায়গা সবার সামনে প্রকাশ করেছিল। আমার বারো বছর বয়সী মেয়েও নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গা স্পষ্ট করে কবিতা লিখেছিল। ব্যাপারটা বেশ আনন্দায়ক। আমি জানি সে যা লিখেছে, সেটা সে নয়। আমি জানি সে যতটুকু বড় মাপের হওয়ার কথা লিখেছে, তা-ও সে নয়। কিন্তু কল্পনার মাধ্যমে নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তাভাবনা শেয়ার করাটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার মেয়ের ও অন্যান্য সকল শিশুর কবিতায় মিথ্যার আশ্রয় ছিল

সত্যি, তবে এসব কারও জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং ইতিবাচক। মাঝেমধ্যে নিজেকে মিথ্যার মাঝে ভাসাতে জানতে হবে। আপনি যা নন, সেটা হওয়ার জন্যও কল্পনা করতে হবে, ভাবতে হবে। মানুষ শুরুতে চিত্র তৈরি করে, তারপর একটা সময় পর চিত্রের সেই ব্যক্তিটি হওয়ার জন্য সকল ধরনের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কোনোকিছু অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্মগত স্বভাব। মানুষ মাত্রই নানারকম অর্জনের ভেতর দিয়ে যেতে চায়। মানুষ মাত্রই চায় বড় মাপের কেউ হয়ে উঠতে। আর এই বড় হয়ে ওঠার শুরুর সোপান হচ্ছে বড় হওয়ার বিষয়টি চিত্রের মতো মনে ফুটিয়ে তোলা। তাই পরামর্শ থাকবে, মাঝেমধ্যে নিজেকে একটু মিথ্যা বলুন।

৪
ইতিবাচক ফলাফলের দিকে নজর রাখুন

আমরা খুব কমই ফোকাস করতে পারি, খুব কমই ফোকাস করে থাকি। বেশিরভাগ সময়ই নানারকম চিন্তাভাবনায় বিচ্ছিন্ন হতে হয় আমাদের। এটা মোটেই ইতিবাচক কোনো বিষয় নয় আমাদের জন্য। এসবের জন্য অবশ্য আমরা নিজেরাই দায়ী। একসাথে হাজারও ইনফরমেশন মস্তিষ্কে ঢোকাতে থাকি আমরা। একসাথে একাধিক কাজের মনোযোগ প্রদর্শন করাটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে কাজের কাজ আর করা হয় না। আসল কাজে আমরা ভালো করতে পারি না। ডালাস কাউবয়ের কোচ জিমি জনসন এ ব্যাপারে ভালো উদাহরণ হতে পারেন। ১৯৯৩ সালের কথা। তিনি তার ফুটবল দলের সবাইকে ম্যাচ শুরুর পূর্বেই খেলার দিকেই সকল মনোযোগ ধরে রাখার কথা বলেছিলেন। তিনি খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"ফোকাস হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেই টিম আজ খেলার প্রতি সবচেয়ে বেশি ফোকাসড হয়ে খেলবে, তারাই বিজয়ী হবে।" জিমি জনসন খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দিয়েছিলেন সকল ক্যামেরা, উপস্থিত দর্শক ও হারের ভয় দূরে সরিয়ে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স করার জন্য। এতে তাদের পক্ষে জয়লাভ করা সহজ হবে। জনসনের এসব কথার প্রতিদান দিয়েছিল সেদিন তার শীর্ষরা। ডালাস কাউবয় সেই খেলায় ৫২-১৭ ব্যবধানে ম্যাচটি জিতে গিয়েছিল।

ডালাস কাউবয়ের পক্ষে নিজেদের জয়লাভ করার পেছনে ভূমিকা পালন করেছিল খেলার প্রতি তাদের মনোযোগ। একজন খেলোয়াড় যখন খেলতে নামবে, তখন খেলার দিকেই তার সকল মনোযোগ থাকা প্রয়োজন। একমাত্র খেলাকে কেন্দ্র করেই নিজের প্রতিটি স্টেপ নিতে হবে তাকে। ক্যামেরা কতগুলো তাক করা আছে, দর্শক কতজন আছে, দর্শকদের সমালোচনা, খেলায় হারার আশঙ্কা কতটুকু, জয়ের সম্ভাবনা কেমন—ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলে আর যা-ই হোক,

কোনোভাবেই বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। অথচ আমাদের বহু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গল্পটাই এমন। আমাদের চারপাশে কোন কোন বিষয় ঘটছে সেসব নিয়ে মারাত্মক পরিমাণে চিন্তিত থাকি। চারপাশের নানা ঘটনা আমাদের মনোযোগকে কাজ থেকে সরিয়ে ফেলে, আমরা নিজের কাজে ফোকাস করতে পারি না। এটাই একটা সময় আমাদের পেছনে ফেলে দেয়। তাই আপনি যদি সত্যি সত্যি নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসেবে দেখতে চান, তাহলে কখনোই কাজ থেকে মনোযোগ সরাবেন না। ফোকাস না করলে কখনোই সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখবেন, নিজের কাজে ফোকাস করাটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আপনার মনোযোগ যত কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে, আপনার সফলতা তত বড় হবে, তত বেশি সফলতা পাবেন আপনি।

৫
ঘাম ঝরাতে শিখুন

আপনার জীবন ততটাই সহজ হয়ে যাবে, যতটা জটিলতা নেওয়ার সক্ষমতা আপনার মাঝে থাকবে। আপনি যত আঘাত সহ্য করবেন, তত ক্ষমতাবান হয়ে উঠবেন। আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতাও তত বেশি বাড়তে থাকবে। অথবা নেভি সিলে যেমন বলা হয়, তেমন করেও বলা যেতে পারে—শান্তির সময়ে আপনি যত বেশি ঘাম ঝরাবেন, যুদ্ধের সময় আপনার রক্ত তত কম ঝরবে। কথাগুলো একটু লক্ষ্য করুন। আমরা বলতে গেলে প্রায় সবাই-ই আরাম-আয়েশের ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে চাই। এটা খারাপ কিছু না। মানুষ মাত্রই আরাম-আয়েশ চাইবে, মানুষ মাত্রই আরাম-আয়েশের জন্য, শান্তি ও স্বস্তি পাওয়ার জন্য কাজ করে থাকে। কিন্তু সবকিছুর লিমিট থাকা প্রয়োজন। শান্তি ও স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি যদি আপনাকে একদম অলস করে দেয়, তাহলেই বিপত্তি। এমন হলে একসময় আপনি নিজের অবস্থানে আর টিকতে পারবেন না, অথবা আপনার জায়গা অন্য কেউ দখল করে নেবে। এটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাকে অবশ্যই শান্তি ও স্বস্তির সময়েও ঘাম ঝরাতে হবে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন।

নেভি সিলের ওপরের কথাটি কিংবা ঘাম ঝরানোর ফায়দা নিয়ে আমার বন্ধু রেট নিকোলস-ই প্রথম আমাকে বুঝিয়েছিল। স্বস্তিদায়ক সময়ে পরিশ্রম করার গুরুত্ব সম্পর্কে আমি তার কাছেই ভালোমতো জানতে পেরেছিলাম। আমি আর আমার বন্ধু রেট নিকোলস বেজবল লীগে খেলতাম। লীগে আমাদের সাথে নানা ধরনের প্রতিযোগী আসত। এদের অনেকেই বেশ ভালো খেলত। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যেত ব্যাটিং করার সময় পিচার আমাদের কতটুকু পারফেক্ট বল ছুড়ত সেদিকেই মনোযোগ থাকত আমাদের। কখনোসখনো এমন ভালো খেলোয়াড়ের সাথে আমাদের খেলতে হতো যে, আমাদের লজ্জায় পড়তে হতো। এটা হওয়ার কারণ ছিল, আমরা পিচারদের করা বলে প্রায় সময়ই হিট করতে পারতাম না। পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেতাম। এটা কোনো মজার বিষয় নয়। সত্যি বলতে পিচারদের সামনে ব্যাট করাটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে জটিল বিষয় ছিল। আর

এটা হতো অপজিট পিচারদের বল ছোড়ার দক্ষতা ও আমাদের ব্যাটিং অদক্ষতার ফলে। এই অবস্থা থেকে নিজেদের বের করে আনাটা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কীভাবে আমরা এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব? এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। পিচারদের বল ছোড়ার দিকেই যদি মনোযোগ থাকে, তাহলে ভালোভাবে বলে হিট করা সম্ভব নয়। এটা নিয়ে একদিন আমার বন্ধু নিকোলসের মাথায় একটা আইডিয়া এলো। সে বলল—

"কেমন হয় যদি আমাদের প্রতিদিনের প্র্যাকটিসের চেয়েও অপজিট পিচারদের বল ছোড়া আরও ধীরগতির হয়?"

"এটাই তো বড় সমস্যা। আমরা তো এমন কাউকে চিনি না যে এত দ্রুতগতিতে বল ছুড়তে পারে। খেলার মাঠে এটা আরও অসম্ভব ব্যাপার। এমন দ্রুতগতির বল ছোড়া ব্যক্তি প্র্যাকটিস করার সময় আমরা পাবো না। আমাদের অপজিশন টিমের পিচাররা খুব জোড়ে বল ছোড়ে। বলটিকে তখন ২০০ মাইল পার আওয়ার গতিতে আমার দিকে তেড়ে আসা অ্যাসপিরিন বলে মনে হয়। এত দ্রুতগতির বলে হিট করাটাই মুশকিলের ব্যাপার। এরচেয়েও দ্রুতগতির বল ছোড়া ব্যক্তিই পাওয়া আরও বেশি মুশকিল।" আমি জবাব দিলাম।

"আমি জানি এত দ্রুতগতিতে বল ছুড়তে পারে এমন কাউকে আমরা চিনি না। এটা আমাদের জন্য সমস্যা বটে। প্র্যাকটিস জোনে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়াটাও মুশকিল। কিন্তু কেমন হয়, যদি এটা বেজবল না হয়? আমি বলতে চাচ্ছি, বেজবলের বল না হলে কেমন হয়?" নিকোলস বলল।

"আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কী বলতে চাচ্ছ তুমি? বেজবল নয় বলতে?" ভুরু কুঁচকে বললাম আমি। নিকোলস তখন হাসল। তারপর পকেট থেকে একটা গলফ বল বের করল। আমার বাবা যেমন গলফ কোর্সে গিয়ে খেলতেন, ঠিক তেমনই একটা গলফ বল তার হাতে দেখতে পেলাম। আমি এবার একটু বিস্মিত হলাম। এটা আবার কী? গলফ বল দিয়ে তো গলফ খেলা হয়। বেজবলের সাথে এটার কী সম্পর্ক আমার মাথায় ঢুকল না।

"যাও, একটা বেজবল ব্যাট নিয়ে আসো।" আমাকে বলল নিকোলস। তার কথামতো আমি একটা বেজবল ব্যাট নিয়ে আসলাম। তারপর নিকোলসের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। নিকোলসের বাড়ির সামনে মাঠের মধ্যে একপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল সে। আমি আরেকপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার হাতে বেজবল ব্যাট। নিকোলস গতানুগতিক পিচারের চেয়েও আরও তিন ফুট সামনে এগিয়ে এলো। তারপর ছোট্ট গলফ বলটি বুলেটের গতিতে আমার দিকে ছুড়ে মারল। আমি সেটিতে হিট করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। নিকোলস এবার হেসে উঠল।

"হাহা, এটা নিশ্চিতভাবেই লীগের খেলায় করা বলের চেয়েও অনেক বেশি গতির। এই গতিতে বল ছুড়ে প্র্যাকটিস করতে পারলে কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা ভালো করতে পারব আরও! চলো তাহলে শুরু করা যাক।"

এরপর থেকে আমরা সেই গলফ বল নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলাম। গলফ বল আকারে বেশ ছোট। তবে প্লাস্টিকের বল হওয়াতে মারাত্মক স্তরের গতিতে সেটি ব্যাটে আসছিল না ঠিকই, তবে একেবারে কমও ছিল না। আর গলফ বলটি আরও এঁকেবেঁকে আমাদের দিকে আসত ছুড়ে মারার পর, যেটি লীগের কোনো খেলোয়াড়ের ছোড়া বলের ক্ষেত্রে কখনোই সম্ভব ছিল না। গলফ বল দিয়ে প্র্যাকটিস করার সময় আমাদের প্রচণ্ড

ধকল সহ্য করতে হয়েছিল। একে তো ছোট বল দেখতে মুশকিল, তার ওপর হাওয়ায় ভাসার সময় কার্ভ ছিল অনেক বেশি। ফলে হিট করা কষ্টকর ছিল। কিন্তু প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এভাবেই সময় কেটে গেল। একসময় বেজবল লীগের নতুন আসর শুরু হলো। এবার আমরা পরিপূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কঠোর পরিশ্রম করে এবং গলফ বলের মতো ক্ষুদ্র বলের প্র্যাকটিস করার ফলে আমাদের ফোকাস করার সক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাই লীগের খেলার সময় বলে হিট করতে আমাদের কোনো অসুবিধাই হয়নি। বেজবল যখন আমাদের দিকে ছুড়ে মারা হচ্ছিল, তখন সেটিকে বড়সড় কোনো বেলুন মনে হচ্ছিল। খুব সহজেই আমরা সেই বলে হিট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এমনকি মনে আছে আমার হিটে বল হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর মুহূর্তগুলো। এটা আমরা কখনোই করতে পারতাম না, যদি নিজেদের স্বস্তিদায়ক সময়ে গলফ বলের মতো ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে জটিল পরিশ্রম না করতাম। নিকোলসের এই কাজটি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিল। আমি কখনোই তার এই আইডিয়ার কথা ভুলতে পারব না। এখনো যদি কোনো কাজ নিয়ে আমার মাঝে ভয় চলে আসে, তখন নিকোলসের সেই আইডিয়ার কথা মনে করি। তারপর যখন নিজের স্বস্তিদায়ক সময়ের প্র্যাকটিস সেশনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করি, তখন বাস্তবিক অর্থেই কাজটি বাস্তবায়ন করতে গেলে সেটি আমার কাছে মজা বলেই মনে হয়।

বক্সার মোহাম্মদ আলী এই আইডিয়া ব্যবহার করতেন। বক্সিংয়ের ক্ষেত্রে এই আইডিয়াই তাকে অনেক বড় সফলতা এনে দিয়েছিল। প্র্যাকটিস সেশনে ফাইট করা অপজিশনকে তিনি মূল সেশনের প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়েও অনেক বড় কাউকে নিতেন। যত বড় ফাইটারের সাথে তাকে বক্সিং করতে হবে, তার চেয়েও ভয়ানক কারও সাথে তিনি প্র্যাকটিস সেশনে বক্সিং করতেন। তারপর মূল সেশনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার কাছে অপরাজেয় কেউ মনে হতো না। ফলে তিনি জয়লাভ করতে পারতেন। কেননা, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে বক্সিং করে প্র্যাকটিস সেশনেই তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে নিতেন।

আপনিও চাইলে এই আইডিয়া অনুসরণ করতে পারেন। বাস্তব জীবনের মঞ্চে আপনাকে যত বড় প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে, তার চেয়েও বড় প্রতিযোগিতার মঞ্চ আপনি নিজে নিজে তৈরি করতে পারেন, দক্ষতা বাড়াতে পারেন। এতে নিশ্চিত করেই বলা চলে আপনি সফল হবেন।

৬
নিজের জীবনকে সহজ করুন

গ্রীন বে প্যাকার্স ফুটবল টিমের কোচ ভিন্স লম্বারডিকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেন তার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলে এত এত মেধাবী খেলোয়াড় থাকতেও তারা সহজ সেটে খেলে থাকে? জবাবে ভিন্স বলেছিলেন—"কনফিউশানের ভেতর থাকলে মানুষ কখনোই আক্রমণাত্মক হতে পারে না। ব্যাপারটা খেলাধুলার জন্যও প্রযোজ্য।" ভিন্স লম্বার্ডির এই কথা আপনার জন্য বেস্ট অপশন হতে পারে। প্রায় সময়ই দেখা যায় আমরা নিজের

জীবনকে জটিল করে ফেলি। নানা বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে থাকি আমরা। অথচ আমাদের উচিত জীবন নিয়ে সহজ একটি অবস্থানে থাকা। এটা সত্য যে, আপনার প্রচুর দায়িত্ব থাকতে পারে নিয়মিতই। সেই দায়িত্বের পাশাপাশি জীবনকে সহজ করে তোলার জন্য অবশ্যই আপনাকে আরও কিছু বিষয় যোগ করে নিতে হবে। কখনোসখনো আমরা পরিবারের জন্যও নানা কাজ করাটাকে বিরক্তিকর মনে করে থাকি। এটাও ঠিক নয়। আপনাকে অবশ্যই কাজের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। মূলত কাজই জীবন। এসবকে যদি আপনি ঝামেলা মনে করে থাকেন, তাহলে চলবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সকল অফিসিয়াল কাজের বাইরেও নানা বিষয় সংযুক্ত করে জীবনকে আনন্দময় ও সহজ করে তোলার চেষ্টা করে থাকি। কখনোসখনো আমাকে বাচ্চাদের জন্য শপিং করতে হয়। আমার মাথায় তখন থাকে বাচ্চাদের জন্য অফিস সেরে শপিংয়ে যেতে হবে। অনেকের জন্যই এসব জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু আমি এসবকে সহজভাবে নিয়েছি। আমি তাই আপনাদেরকে জীবনকে সহজভাবে নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছি। আমাকে এমনও হয় যে, মেয়ে স্টেফানির বুক রিপোর্ট পড়ে দিতে হয়। আর এই বুক রিপোর্ট পড়ার কাজটিও আনন্দের সাথে করে থাকি। এতে আমার মনে হয় সবার সাথে বেশ ভালো সময় কাটাতে সক্ষম হচ্ছি আমি। একই কারণে আমি অফিসের কাজের পর বাচ্চাদের সাথে আরও বেশি সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরিবারের সাথে সময় কাটানো এবং জীবনকে সহজভাবে নেওয়ার মধ্যে প্রশান্তি সংযুক্ত রয়েছে। আপনি যখন এগ্রেসিভ মোড নিয়ে এগ্রেসিভ লাইফস্টাইলকে সঙ্গী করে সামনের দিকে এগোতে থাকবেন, তখন মন ভরে উঠবে অশান্তিতে। অতএব, নিয়মিত কাজের বাইরে কোন বিষয়গুলো সংযুক্ত করে জীবনকে সহজ করে তোলা যায় এটা নিয়ে একটু ভাবুন। আমি যদিও শপিং করার জন্য যাই (যদিও কাজটিকে সহজ মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়। বেশিরভাগ সময়ই আমি শপিং করার জন্য সময় বের করতে গিয়ে মুশকিলে পড়ি)। আপনি চাইলে নতুন কিছু বের করতে পারেন।

জীবনকে সহজ করে তোলার আরও একটি উদাহরণ হচ্ছেন বব কোয়েথার। তিনি ছিলেন ইনফিনকমের প্রেসিডেন্ট। তার কাজ করার শিডিউল ও টাইম ম্যানেজমেন্ট একদম সহজ ছিল। তিনি সবসময়ই অন টাইমে কাজ করতে পছন্দ করেন। তার হাতে যদি এই মুহূর্তে একটি কাজ আসত, তাহলে সাথে সাথেই সেটি করে ফেলতেন এবং অন্যান্য কাজের দিকে নজর দিতেন। তিনি ভবিষ্যতের জন্য কোনোরকম অপ্রয়োজনীয় টাস্ক নিয়ে নিজের সময় নষ্ট করতেন না। অহেতুক কোনো কারবারে নিজেকে জড়ানোর রীতি তার ছিলই না। একবার আমি তার অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে তাকে এমন একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছিলাম, যার কোম্পানিতে ট্রেইনিং করানোর কথা ছিল আমার।

"আপনি কি আমার কথাগুলো নোট করে রাখবেন এবং পরবর্তী সময়ে তাকে একটি কল করে জানাবেন যে আমি তাকে কল করব?" আমি জিজ্ঞেস করলাম মিস্টার ববকে।

"নোট?" বিস্মিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

তারপরের ঘটনা আমার জানা ছিল এবং তিনি স্বভাবসুলভ কাজই করলেন। ফোন হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে কল করে আমার কথা জানালেন। ফের বললেন—

"বলে দিয়েছি। এরপর বলুন কী করতে হবে?"

আমি তার কাজে অবাক হলাম। এরপর তাকে সেই ফাইলের কথা জানালাম, যেটি আমি তার সার্ভিস টিমের জন্য তৈরি করেছিলাম। আমি তাকে পড়ার জন্য সেটি দিলাম।

"এটি আপনার সার্ভিস টিমের ট্রেইনিং রিপোর্ট। আপনি সময় করে এটি পড়ে আমাকে মতামত জানাতে পারেন।" বললাম আমি।

"এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন।" জবাবে বললেন তিনি। তারপর ডুবে গেলেন রিপোর্টের ভেতর। দীর্ঘ দশ মিনিট একদম মগ্ন হয়ে রিপোর্টের আদ্যোপান্ত পড়লেন বব। তারপর আমার দিকে তাকালেন। রিপোর্ট নিয়ে আমাদের কথা হলো। ফাইল আকারে জমা হলো সেটি।

এটাই ছিল বব কোয়েথারের টাইম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটি ছিল এমন একটি সিস্টেম, যা কারও ক্ষেত্রেই সচরাচর দেখা যায় না। টাইম ম্যানেজমেন্টের এই ধরনকে কী বলা যায়? সম্ভবত এটির নাম হতে পারে—সব কিছু তাৎক্ষণিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ করুন। এমনটাই হতে পারে। এসবের বাইরে তেমন কিছুই আমি ভেবে পাইনি। বব কোয়েথার ছিলেন একজন এগ্রেসিভ ও সফল সিইও। ভিন্স লমবার্ডি বলেছেন—"কনফিউশানের ভেতর থাকলে মানুষ কখনোই আক্রমণাত্মক হতে পারে না।" বব কোয়েথারের মাঝে কনফিউশান ছিল না।

অনেক লোকই নিজেদের সৃজনশীল হিসেবে দেখতে চায় না। সৃজনশীলতা তাদের কাছে জটিলতা বলে মনে হয়। সৃজনশীলতার মানেই অনেক গুরুতর কিছু এমনটা সচরাচর সবার ভাবনাতেই থাকে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। সৃজনশীলতা কস্মিনকালেও জটিল কিছু ছিল না। সৃজনশীলতা জটিলতা থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার জন্যই এসেছে। সৌন্দর্যবর্ধন, সহজে কাজ সমাপ্তি, সহজ পদ্ধতির আবিষ্কার এগুলো সৃজনশীলতার নিদর্শন, যা মূলত মানুষের জীবন আরও সহজতর করে তোলার জন্যই। তাই সৃজনশীলতাকে জটিল ভাবার কিচ্ছু নেই। যারা সৃজনশীলতাকে জটিল ভাবে, তারা নিজের জীবন সহজ করে তুলতে পারে না। আর জীবন সহজ না হলে জীবন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

মাইকেলেঞ্জেলোর নাম আপনারা শুনেছেন। তার ডেভিডের মূর্তির সৃজনশীলতার প্রশংসা সবাই করে থাকে। মাইকেলেঞ্জেলোর কাজের প্রশংসায় সয়লাব পুরো বিশ্ব। না জানি কত কঠিন একটি কাজ সম্পন্ন করেছেন তিনি, এমনটাই মনে হতে পারে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে মাইকেলেঞ্জেলো নিজেই বলেছিলেন তার সুন্দর মূর্তির স্বরূপ তিনি আগেভাগেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি কেবল পাথরের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ছাঁটাই করেছিলেন, মূর্তিটি গঠনে যেগুলো অহেতুক ছিল। আর এভাবেই অবশেষে দারুণ একটি স্ট্যাচু তৈরি করতে পেরেছিলেন মাইকেলেঞ্জেলো। শেষ হওয়ার পর আমরা মূর্তিটির দারুণ আকৃতি দেখতে পাই। আমাদের জীবনটাও এমন। এখানে আমাদের দেখতে হবে জীবনের কোন কোন বিষয়গুলো অপ্রয়োজনীয়। সেই অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে জীবন সহজ করে তুলতে হবে। হাজারও নিয়মের বালাইয়ে অতিষ্ঠ নয়; বরং কার্যকরী পদ্ধতিতে জীবনকে সহজ করে নেওয়া দরকার।